দ্বিতীয় অধ্যায় : সংস্কার বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা

বাংলায় উনিশ শতকে সাময়িকপত্র, সংবাদপত্র ও সাহিত্যে সমাজের ভূমিকা

বাঙালি সংবাদপত্রের সাথে প্রথম পরিচিত হয় 1818 সালে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের মাধ্যমে।

সেই সময়ের সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ছিল 'সমাচার দর্পন' এবং মাসিক পত্রিকা ছিল 'দিগদর্শন' । উভয়ই শ্রীরামপুর ত্রয়ীর মাধ্যমে প্রকাশিত হয় । পরবর্তীতে প্রকাশিত হয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' ।

এছাড়াও 'তত্ত্ববোধিনী', 'বামাবোধিনী', 'ভারতী', 'প্রবাসী', প্রভৃতি সাময়িক জীবনযাপন সম্মন্ধিত পত্রিকা এবং 'বঙ্গদর্শন', 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা', 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট', 'বেঙ্গলি' প্রভৃতি ভাবনামূলক পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে ।

সাময়িক পত্রিকা হিসেবে 'বামাবোধিনী'

'বামাবোধিনী' পত্রিকা ছিল তৎকালীন সমাজের সামাজিক প্রতিফলনের এক উল্লেখযোগ্য অংশ । **1863 সালে উমেশচন্দ্র দত্ত** কয়েকজন তরুণ ব্রহ্মকে নিয়ে 'বামাবোধিনী সভা' গঠন করেন যার মূল লক্ষ্য ছিল সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করা, নারীদের শিক্ষার প্রসার ঘটানো, যোগ্য মর্যাদা স্থাপন করা । এই সময়েই উমেশচন্দ্র দত্ত 'বামাবোধিনী' পত্রিকা প্রকাশনা করেন ।

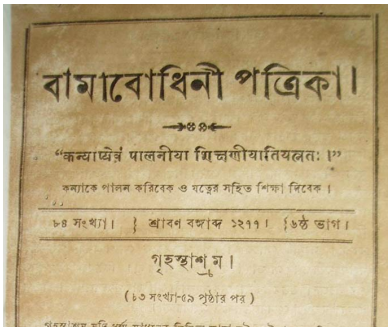
বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৮৪ সংখ্যা। | শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১২৭১। | ৬ষ্ঠ ভাগ।

গৃহস্থাশ্রম।

(৮৩ সংখ্যা-৫৯ পৃষ্ঠার পর)

এই পত্রিকায় স্ত্রীশিক্ষাকে সমর্থন করে এবং বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ-র বিরোধিতা করে নারী কল্যাণের বহু দিক তুলে ধরা হয় । বিভিন্ন মহিলা লেখিকা যেমন - **স্বর্ণপ্রভা বসু, লাবন্যপ্রভা বসু** এই পত্রিকায় ছদ্মনামে লিখতেন । পরে অবশ্য তারা আত্মপ্রকাশ করেন।

সূচনাকাল থেকে শুরু করে দীর্ঘ **ষাট বছর** 'বামাবোধিনী' পত্রিকা দেশীয় নারীদের সকল পরিস্থিতি প্রতিস্থাপিত করেছিল যার ফলস্বরূপ এটি একটি ঐতিহাসিক উপাদানে রূপান্তরিত হয়েছে ।

সংবাদপত্র হিসেবে 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'

1853 খ্রিস্টাব্দের 6 জানুয়ারি গিরিশচন্দ্র ঘোষের সম্পাদনায় তৎকালীন সমাজের এক উল্লেখযোগ্য **সাপ্তাহিক পত্রিকা** 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' প্রকাশিত হয় । পরে 1892 সালে এটি **দৈনিক পত্রিকা** হিসেবে প্রকাশিত হতে শুরু করে । পরবর্তী সময়ে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় পত্রিকাটি আরো জনপ্রিয় হতে শুরু করে এবং তিনি পত্রিকার বিষয়বস্তু অনেক বেশি সামাজিক করে তোলেন ।

তিনি বাংলার সামাজিক শোষণ, নীলকর সাহেবদের অত্যাচার, বহুবিবাহ, মদ আমদানি প্রভৃতির বিরুদ্ধে তীব্র হুংকার তোলেন এছাড়াও সাম্রাজ্যবাদী শাসক লর্ড ডালহৌসির নগ্ন সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতির সম্পর্কেও আলোচনা করেন ।

হরিশচন্দ্র তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে ঈশ্বরচন্দ্র প্রবর্তিত বিধবাবিবাহ সম্পর্কে নানান মতামত ব্যক্ত করেন । নারীশিক্ষার প্রসারের কথা তুলে ধরেন এবং পতিতা সমস্যার কথাও বলেন । এছাড়াও ' হিন্দু প্যাট্রিয়ট ' পত্রিকায় সমকালীন সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীলকর সাহেবদের সীমাহীন শোষণের বহু বিষয় সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ।

সারা বাংলায় সংবাদদাতা নিয়োগের মাধ্যমে নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে বিবরণ সংগ্রহ করেন যা 'নীল জেলা' নামক নতুন বিভাগে প্রকাশিত হতে শুরু করে । 1860 সালে নীল কমিশন গঠন 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।

হরিশচন্দ্র মহাশয়ের পর কৃষ্ণদাস পাল 1862 সালে এই পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন । এরপর 1892 খ্রিস্টাব্দে এটি দৈনিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হতে শুরু করে ।

সংবাদপত্র হিসেবে 'গ্রামবার্ত্তা পত্রিকা'

'গ্রামবার্ত্তা পত্রিকা' উনিশ শতকের গ্রামীণ সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল । **1863 সালে হরিনাথ মজুমদার** এটি সম্পাদিত করেন। গ্রামবার্ত্তা **প্রথমে মাসিক পত্রিকা** হিসেবে প্রকাশিত হলেও পরবর্তী সময়ে যথাক্রমে **পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা** হিসেবে প্রকাশিত হয় ।

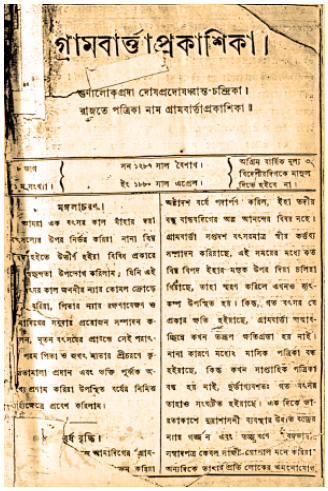
গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা।

ব্রিটিশ সরকারের শাসন, মহাজনদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই পত্রিকা তীব্র আওয়াজ তোলে এমনকি হরিনাথ মজুমদার নীলকুঠিতে কাজ করার সময় নীলকর সাহেবদের যে অত্যাচার দেখেছিলেন তাও প্রকাশ করেছিলেন।

পুলিশের কাছে সাহায্য চেয়েও কোনো সুরাহা হতো না বরং অভিযোগকারী নির্যাতিত হতেন। এইরকম সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে কাঙাল হরিনাথ বাংলার মানুষকে সচেতন করতে 'গ্রামবার্ত্তা পত্রিকা' প্রকাশিত করেন ।
জমিদার, জোতদারদের কথা পত্রিকায় লেখার ফলে তাদের রোষের শিকারও হতে হয় তাকে । লালন ফকির তাকে জমিদারদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছিলেন ।
শোষণ ও অত্যাচারের পাশাপাশি এই পত্রিকায় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও লালন ফকিরের গান এবং নারীশিক্ষার বিষয়ও প্রকাশিত হয়। শেষের দিকে অর্থের অভাবে পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায় ।

হুতোম প্যাঁচার নকশা

উনিশ শতকে সমাজসেবক **কালী প্রসন্ন সিংহ** কর্তৃক প্রকাশিত 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' ছিল তৎকালীন সমাজের **বিদ্রূপাত্মক সামাজিক নকশা** । মাত্র 30 বছর বয়সে 1861 খ্রিস্টাব্দে হুতোম প্যাঁচা ছদ্মনামে তিনি গ্রন্থটি প্রকাশ করেন ।
গ্রন্থটির প্রথমাংশে কলকাতার চড়কপার্বন, বারোয়ারি পূজা, ছেলেধরা, ক্রিশ্চানি হুজুগ, সাতপেয়ে গরু ইত্যাদি বিষয়ে বলা হয়েছে । সমাজের বিভিন্ন অংশে চলা ভন্ডামীর তিনি তীব্র নিন্দা করেছিলেন । পাশ্চাত্য ভাবে শিক্ষিত হওয়া কলকাতার ধনী,নব্য-বাবুসমাজের প্রতি তিনি তীব্র নিন্দা করতেন।
সমাজের ব্যক্তিবর্গকে তিনি তিন ভাগে বিভক্ত করেছিলেন । যারা হলেন - ইংরেজি জানা পাশ্চাত্য অনুকরণকারী, ইংরেজি জানা অথচ সাহেবি অনুকরণকারী নয় এমন নব্য সমাজ এবং গোঁড়া হিন্দুসমাজ । সমাজের সকল প্রকৃতির মানুষের কথা লেখক রচনাটিতে ব্যক্ত করেছেন। তৎকালীন সমাজের এই গ্রন্থটি ছিল **ব্যঙ্গাত্মক সাহিত্যের নিদারুণ উদাহরণ** ।

নীলদর্পণ নাটক

দীনবন্ধু মিত্র ১৮৬০সালে 'নীলদর্পণ' রচনা করেন। ঢাকা থেকে নাটকটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি হয়, নীলকর সাহেবদের অত্যাচার জনমানসে শিহরণ সৃষ্টি করে।
উনিশ শতকে ইংরেজ সহ বিভিন্ন ইউরোপীয় ব্যবসায়ী বাংলার চাষিদের নীলচাষে বাধ্য করে। খাদ্যশস্য উৎপাদন বন্ধ হলে চাষিরা আর্থিকভাবে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে ১৮৫৮ সালে অত্যাচারিত নীলচাষিরা নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে 'নীলবিদ্রোহ' ঘোষণা করে ।
এই নাটক বাঙালির মনে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবাদী মনোভাবের সৃষ্টি করে ।

ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় নাটকটি অনুবাদিত হলে বাংলার নীল চাষিদের দুর্দশার কথা সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পরে । **১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল থিয়েটার বা জাতীয় নাট্যশালার প্রথম নাটক ছিল 'নীলদর্পণ'।** উনিশ শতকে সামাজিক পরিস্থিতিতে সংবাদ পত্রের ভুমিকা ছিল অনস্বীকার্য । তবে তার প্রভাব শহরতলীতেই বেশি ছিল।

বাংলায় উনিশ শতকে শিক্ষা সংস্কার

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠার শুরুর দিকে ভারতে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল খুবই সঙ্কীর্ণ । হিন্দুদের টোল ও পাঠশালা এবং মুসলিমদের জন্য মাদ্রাসাগুলি ছিল শিক্ষাদানের প্রধান কেন্দ্র। তবে জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ে কোন চর্চাই প্রতিষ্ঠানে হত না বরং ধর্মীয় কাহিনি, আরবি, ফারসি, সংস্কৃত প্রভৃতি দেশীয় শিক্ষা দেওয়া হত।
তাই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মনে করত যে—

1. ভারতীয়দের যাতে শিক্ষার অগ্রগতি হয় তার জন্য ব্রিটিশদের অর্থসম্পদ ব্যয় করার কোনো প্রয়োজন নেই
2. ব্রিটিশরা যদি ভারতীয়দের ধর্মভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে তবে তারা সরকারের বিরধিতা করতে পারে
3. আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা পেলে ভারতীয়রা ভবিষ্যতে স্বাধীনচেতা হয়ে উঠবে

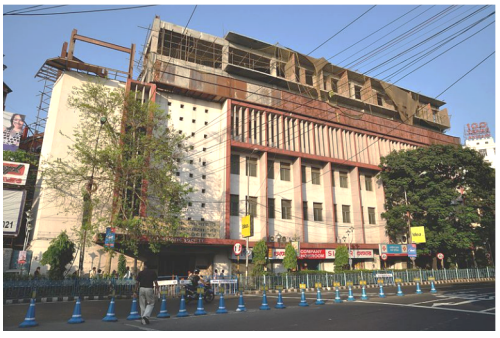

এই মানসিকতার ফলে ইংরেজ কোম্পানি সংস্কৃত এবং আরবি-ফারসি শিক্ষাকেই গুরুত্ব দিয়ে রাজ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন যেমন -

- ওয়ারেন হেস্টিংসের উদ্যোগে কলকাতা মাদ্রাসা (১৭৮১ খ্রি.),
- উইলিয়াম জোনস এর উদ্যোগে এশিয়াটিক সোসাইটি (১৭৮৪ খ্রি.),
- লর্ড ওয়েলেসলি উদ্যোগে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০ খ্রি.) প্রভৃতি প্রাচ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় ।

পাশ্চাত্যবাদী বনাম প্রাচ্যবাদী বিতর্ক

ঔপনিবেশিক শাসনকালীন সময়ে 1813 খ্রিস্টাব্দের সনদ আইন অনুযায়ী কোম্পানি ভারতীয় শিক্ষাখাতে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যায় করার এক অভূতপূর্ব সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু এই টাকা কোন খাতে ব্যয় হবে তাই নিয়ে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দ্বন্দ্বের শুরু হয়।

ইংরেজি ভাষাকে হাতিয়ার বানাতে চেয়েছিলেন মেকলে, রাজা রামমোহন রায়, আলেকজান্ডার ডাফ প্রমুখ। তাদের মতে শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত ছিল ইংরেজি, বিষয় হওয়া উচিত পাশ্চাত্যের জ্ঞান - বিজ্ঞান । এভাবে এদেশে প্রাচ্য না পাশ্চাত্য কোন ধরনের শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগ নেওয়া উচিত সেবিষয়ে একটি দ্বন্দ্ব শুরু হয় যা 'পাশ্চাত্যবাদী বনাম প্রাচ্যবাদী বিতর্ক' নামে পরিচিত।

টমাস ব্যাবিংটন মেকলের ভূমিকা

লর্ড বেন্টিঙ্কের আইন সচিব **টমাস ব্যাবিংটন মেকলে** 'জনশিক্ষা কমিটি'র সভাপতি নিযুক্ত হওয়ার পর ভারতে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে **প্রাচ্যবাদী** বা **ওরিয়েন্টালিস্ট** (এইচ. টি. প্রিন্সেপ, কোলব্রুক) এবং **পাশ্চাত্যবাদী** বা **অ্যাংলিসিস্ট** (টমাস ব্যাবিংটন মেকলে, আলেকজান্ডার ডাফ, সন্ডার্স, কল্ভিন প্রমুখ) নামে দুটি দল তৈরি হয়

১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতে পাশ্চাত্যশিক্ষা প্রবর্তনের দাবি জানিয়ে লর্ড বেন্টিঙ্কের কাছে একটি প্রস্তাব দেন যা **'মেকলে মিনিটস'** নামে পরিচিত। প্রস্তাবে মেকলে বলেন যে :

- পাশ্চাত্যের তুলনায় প্রাচ্যের শিক্ষা বৈজ্ঞানিক চেতনাহীন এবং সম্পূর্ণ নিকৃষ্ট
- এই দেশের পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়া দরকার কারণ রাজ্যের সভ্যতা দুর্নীতিগ্রস্ত ও অপবিত্র
- তার ধারণা ছিল ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটলে এদেশে উচ্চ ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে চুইয়ে পড়া নীতি অনুসারে দেশবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে।
- ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে মেকলে প্রস্তাবের সুপারিশ মেনে লর্ড বেন্টিঙ্ক এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারকে সরকারের শিক্ষানীতি হিসেবে ঘোষণা করেন।

ইংরেজি শিক্ষার প্রসার

উনিশ শতকে শুরুতেই ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে ব্রিটিশ বাণিজ্য, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস আদালত প্রভৃতির যথেষ্ট প্রসার ঘটলে, এসব প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি ভাষা জানা কর্মচারীর প্রয়োজন দেখা দেয়।
এর ফলে চাকরি পাবার আশায় মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীদের ইংরেজি শেখার প্রতি আগ্রহ দেখা গেলে কিছু খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারক সংস্থার উদ্যোগে বিভিন্ন শহরে বেশ কয়েকটি ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্যাপটিস্ট মিশনের উইলিয়াম কেরি, মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রমুখের উদ্যোগে ১২৬টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

1. ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর কলেজ,
2. ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় 'জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইন্সটিটিউশন'
3. জেসুইট মিশনারি কলকাতায় ‘সেন্ট জেভিয়ার্স’(১৮৩৫) এবং ‘লরেটো স্কুল’ (১৮৪২) প্রতিষ্ঠা করেন।

অন্যদিকে বাংলায় ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের জন্য রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, ডেভিড হেয়ার, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ অগ্রণী হয়। তাদের উদ্যোগে বিভিন্ন স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় যেমন -

1. রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে -
    - ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় হিন্দু কলেজ
    - ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ
    - ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে অ্যাংলো হিন্দু স্কুল
2. ডেভিড হেয়ারের নেতৃত্বে পটলডাঙ্গা একাডেমি (১৮১৮) যার বর্তমান নাম হেয়ার স্কুল।

ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বিভিন্ন স্থানে ক্যালকাটা বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় আবার ইংরেজি ভাষায় পুস্তক রচনার জন্য ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি গড়ে ওঠে। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে বোর্ড অফ কন্ট্রোল-র সভাপতি স্যার চার্লস উড শিক্ষা বিষয়ক একটি নির্দেশনামা প্রকাশ করেন যা উডের ডেসপ্যাচ বা উডের নির্দেশনামা নামে পরিচিত, এটিকে মহাসনদ বলা হয়ে থাকে। এই নির্দেশ নামার উদ্দেশ্য ছিল-

- কলকাতা, মুম্বাই, মাদ্রাজ-এ একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা
- স্ত্রী শিক্ষার প্রসার
- উচ্চশিক্ষায় ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব
- একটি আলাদাভাবে শিক্ষা দপ্তর গঠন
- শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা

নারী শিক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্রের ভূমিকা

নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন খ্রিস্টান মিশনারীরা।

1. ১৮১১খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরের খ্রিস্টান মিশনারি উইলিয়াম কেরি ও মার্শম্যানের উদ্যোগে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।
2. ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন মিশনারি সোসাইটি একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন

3. ব্যাপ্টিস্ট মিশন কতৃক প্রতিষ্ঠিত হয় ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি (১৮১৯)
4. ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল (১৮২৮)

এছাড়া কলকাতা বুক সোসাইটি (১৮১৭) , লেডিজ সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন (১৮২৪) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়।

উনিশ শতকের সামাজিক সংস্কারক হিসেবে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় । নারীমুক্তির উদ্দেশ্যে এবং সামাজিক অসহায়তার বিরুদ্ধে তিনি মুখর প্রতিবাদী ছিলেন। বাস্তববাদী সংস্কারক হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন অন্যতম দৃষ্টান্ত।

- ভারতের প্রথম বালিকা বিদ্যালয় ‘ হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়’ (১৮৪৯) প্রতিষ্ঠা করেন ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ড্রিংক ওয়াটার বেথুন । যেটি বর্তমানে বেথুন স্কুল নামে পরিচিত।
- গ্রামাঞ্চলে নারীদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জেলায় স্ত্রী শিক্ষা বোধোয়নী সম্মিলনী প্রতিষ্ঠা করেন।
- ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৮৮ টি।
- ১৮৫৮খ্রিস্টাব্দে মে মাসের মধ্যে তিনি ৩৫ টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।
- ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন যা বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ নামে পরিচিত।
- বীরসিংহ গ্রামে ভগবতী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলায় নারী শিক্ষার প্রসার ঘটলে বেশ কয়েকজন কৃতি নারির উদ্ভব হয় যেমন – কাদম্বিনী গাঙ্গুলি, প্রথম মহিলা স্নাতক ও চিকিৎসক ।

পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে রাজা রামমোহণ রায় ও রাধাকান্ত দেবের ভূমিকা

রাজা রাম মোহন রায়

ঊনিশ শতকে বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে যেসকল বাঙালি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রাজা রামমোহন রায় ও রাজা রাধাকান্ত দেব । রাজা রামমোহন রায় মনে করতেন যে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত না হলে ভারতীয়দের সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার দূর হবে না।

পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের জন্য তিনি ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় 'অ্যাংলো হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনের মাধ্যমে কোম্পানি ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য বার্ষিক ১ লক্ষ টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। রামমোহন আধুনিক বিজ্ঞান ও ইংরেজি

শিক্ষার প্রসারের জন্য ব্যয়ের দাবি জানান এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের কাজে তিনি ডেভিড হেয়ার, আলেকজান্ডার ডাফ প্রমুখকে নানাভাবে সহায়তা করেন।
তিনি বিভিন্ন ইংরেজি সাহিত্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদের জন্য হিন্দু কলেজের ছাত্রদের উৎসাহিত করেন। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে একটি বেদান্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন শিক্ষার্থীদের মন থেকে সামাজিক কুসংস্কার মূর্তিপূজা সংস্কার দূর করার জন্য।

রাজা রাধাকান্ত দেব

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাধাকান্ত দেব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি এই কলেজে পরিচালক মন্ডলীর মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি এবং স্কুল বুক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' নামে ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত হন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার জন্য তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্রদের উৎসাহিত করতেন।

ডেভিড হেয়ার

ঊনিশ শতকে বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে ইউরোপের যেসকল ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছিলেন তাদের মধ্যে ডেভিড হেয়ার অগ্রগণ্য। ব্যবসার উদ্দেশ্যে ভারতে এসে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ভারতীয়দের কল্যাণের উদ্দেশ্যে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে যিনি প্রয়াসী হয়েছিলেন তিনি হলেন ডেভিড হেয়ার।
মানবজাতির কল্যাণে এই দেশে কাজ করার জন্যে তিনি আর নিজের দেশে ফেরেননি । এই অর্থ তিনি এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের কাজে ব্যয় করার আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন।
তাঁর প্রবল উদ্যোগে-

- ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৮১৭ সালে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনার উদ্দেশ্যে তিনি স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন।
- ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় 'পটলডাঙ্গা একাডেমি' প্রতিষ্ঠা করেন যার বর্তমান নাম 'হেয়ার স্কুল' ।

কলকাতা মেডিকেল কলেজে প্রথম শব ব্যবচ্ছেদেও হেয়ারের সমর্থন ছিল। কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষাদানের জন্য সরকার অর্থব্যয় বন্ধ করে দেয়। ফলে পাশ্চাত্যের আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা এদেশে দ্রুত প্রসার লাভ করে। এই কলেজ বাংলা তথা ভারতের চিকিৎসাবিদ্যার অগ্রগতির ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা করে।

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ইতিহাস

লর্ড বেন্টিঙ্ক ভারতে চিকিৎসাবিদ্যা পঠনপাঠন উন্নত করতে ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে একটি কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ভাষায় ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে কলকাতায় ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ‘মেডিকেল কলেজ’ নামে একটি আধুনিক কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় যা সাধারণভাবে ‘কলকাতা মেডিকেল কলেজ' নামে পরিচিত।
প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত হন মন্টফোর্ড ব্রামলি। কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষাদানের জন্য সরকার অর্থব্যয় বন্ধ করে দেয়। ফলে পাশ্চাত্যের আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা এদেশে দ্রুত প্রসার লাভ করে।
কলকাতা মেডিকেল কলেজ হল এশিয়ার দ্বিতীয় কলেজ, যেখানে ইউরোপীয় চিকিৎসাবিদ্যা শেখানো হত। এই কলেজ বাংলা তথা ভারতের চিকিৎসাবিদ্যার অগ্রগতির ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা করে। এখান থেকে পাস করা উমেশচন্দ্র শেঠ, রাজকৃষ্ণ দে, দ্বারকানাথ গুপ্ত প্রমুখ ডাক্তার ঢাকা, চট্টগ্রাম, মুরশিদাবাদ, পাটনা প্রভৃতি স্থানে হাসপাতালের কাজে নিযুক্ত হন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস

লর্ড ক্যানিং এর শাসনকালে স্যার চার্লস উড-এর নির্দেশে ১৮৫৭ সালে ‘ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন’ অনুসারে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই বিশ্ববিদ্যালয় ছিল দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম পাশ্চাত্য ধাঁচের বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মডেলে তৈরি।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম আচার্য ছিলেন লর্ড ক্যানিং এবং প্রথম উপাচার্য ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার জেমস্ উইলিয়াম কোলভিল ।
১৯০৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে এটি দেশের বৃহত্তম গবেষণা শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় উপাচার্য থাকার সময় এই বিশ্ববিদ্যালয় খ্যাতি দিকে দিকে ছড়িয়ে

পরে । বাংলা তথা ভারতে আধুনিক শিক্ষার প্রসারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা বিশেষে গুরুত্বপূর্ণ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে যদুনাথ বোস ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম স্নাতক হন। ভারতের প্রথম মহিলা স্নাতক চন্দ্রমুখী বসু ও কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় এখানকার ছাত্রী ছিলেন।

উনিশ শতকের বাংলায় সমাজসংস্কার

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের আগে উনিশ শতকের দিকে বাংলার সমাজজীবন ছিল খুবই সঙ্কীর্ণ। নানা ধরনের কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, গোঁড়ামি, ইত্যাদির পাশাপাশি সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, দেবদাসীপ্রথা, জাতিভেদপ্রথা, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি সমাজের ভীতকে জুড়ে বসেছিল । এই সময় শিক্ষিত নব্য গোষ্ঠীর উদ্যোগে বাংলার সামাজিক কুপ্রথাগুলির বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়।

সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজ

সমাজ সংস্কারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছিল ব্রাহ্মসমাজ। এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ। ১৮২৮ সালে রাজা রাম মোহন রায় ব্রাহ্মসভা গঠন করেন ।

১৮৩০ সালে, এর নতুন নাম হয় ‘ব্রাহ্মসমাজ’। রামমোহনের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজ একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা, পৌত্তলিকতার অবসান, সর্বধর্ম সমন্বয়সাধন, মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি উদ্দেশ্যে এক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলে, এজন্য তাঁকে ঐতিহাসিক স্পিয়ার ‘আধুনিক ভারতের স্রষ্টা’ বলা হয়।

সমাজসংস্কারক রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম জোরালো প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিনি লোকশিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করে তুলে সতীদাহ প্রথার অবসান ঘটাতে চাইছিলেন।

রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ সালে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সতীদাহ নিষিদ্ধ করেন ।

রামমোহন রায়ের পরবর্তী সময়ে ব্রামহসমাজের হাল ধরেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । তাঁর প্রচেষ্টায় ১৮৩৯ সালে ‘তত্ত্ববোধিনী’ সভা গড়ে ওঠে।

১৮৪৩ সালে এই সভা থেকেই প্রকাশিত হয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা যার প্রথম সম্পাদক ছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত ।

এই পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক কুসংস্কার, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, জাতিভেদ প্রথা প্রভৃতির দূরীকরণ এবং বিধবা বিবাহ, নারী শিক্ষা, অসবর্ণ বিবাহ প্রভৃতির প্রয়োগ ঘটানো।

সতীদাহ প্রথা বিরোধী আন্দোলনের ইতিহাস

উনবিংশ শতকের শুরুতে একটি মধ্যযুগীয় নিষ্ঠুর বর্বরতা প্রচলিত ছিল যেটি সতীদাহ প্রথা নামে পরিচিত। সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে একটি বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেন যার উদ্দেশ্য ছিল, শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষকে সচেতন করে তোলা।

তিনি সংবাদ কৌমুদী পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধ প্রকাশ করেন এবং হিন্দু শাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে, সতীদাহ প্রথা হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্রবিরোধী।

শেষ পর্যন্ত উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক কর্তৃক ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে 17 নম্বর ‘রেগুলেশন আইন’ পাশ করলে এই আইনের দ্বারা সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হয়।

ভারতের ইতিহাসে নব্য বঙ্গ গোষ্ঠীর অবদান

হিন্দু কলেজের অধ্যাপক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর উদ্যোগে পাশ্চাত্য ভাবধারা, যুক্তিবাদ ও সততার মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে তিনি এবং তরুণ ছাত্রদল নব্যবঙ্গ গোষ্ঠী রূপে আত্মপ্রকাশ করেন ।

- হিন্দুসমাজ , খ্রিষ্টধর্ম ও পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে সনাতন হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করা এবং হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামি, কুপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করাই ছিলো নব্যবঙ্গ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ।
- হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামি, কুপ্রথার বিরোধিতা করাই ছিলো নব্যবঙ্গীও গোষ্ঠীর মূল কাজ ।
- 1828 সালে ' অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন ' নামে এক বিতর্ক সভা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ডিরোজিওর ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ছাত্ররা সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করতে উদ্যোগী হয় ।
- তারা বহুবিবাহ, নারীশিক্ষা , সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়ে পার্থেনন ও ক্যালাইডোস্কপ নামক পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন ।
- ডিরোজিওর অনুগামীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, রাধানাথ শিকদার, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ।

পরবর্তী সময়ে নব্যবঙ্গীয় গোষ্ঠীর সমালোচনা হয়েছিলো । ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী নব্যবঙ্গীয়দের নকল গোষ্ঠী বলেছিলেন । ডিরোজিওর মৃত্যুর পরবর্তীকালে তার অনুগামীদের উদ্যোগে প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। যেমন -

- **‘জ্ঞানান্বেষণ’**
- **‘এনকোয়েরার’**
- **‘বেঙ্গল স্পেক্টেটর’**
- **‘হিন্দু পাইওনিয়ার'**

বিধবাবিবাহ আন্দোলনের ইতিহাস

হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহের মতো কুপ্রথা প্রচলিত থাকায় অসংখ্য নারীকে অল্প বয়সেই বিধবা হতে হত। সমাজে বিধবা নারীরা সীমাহীন দুর্দশার মধ্যে বাস করতে বাধ্য হত। উনিশ শতকের মধ্যভাগে ভারতের বিভিন্ন সমাজসংস্কারক সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলনের উদ্দেশ্যে আন্দোলন গড়ে তোলেন। 'তত্ত্ববোধিনী’, ‘সংবাদ প্রভাকর' সহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিধবাবিবাহের সপক্ষে প্রচার চালানো হয়। এ বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে বিধবাবিবাহের সমর্থনে জনমত গঠন করতে থাকেন।

সমকালীন সমাজে বিধবা নারীদের দ্বিতীয়বার বিবাহের কোনো অনুমতি ছিল না । বিধবাবিবাহের সমর্থনে তিনি শক্তিশালী জনমত গঠন করেছিলেন। লর্ড ডালহৌসি 15 নং রেগুলেশন আইনের দ্বারা বিধবাবিবাহ আইন পাশ করেন । এরপর 1856 সালে 26 শে জুলাই বড়লাট লর্ড ক্যানিং আইনি স্বীকৃতি দেন।

1856 সালের 7 ডিসেম্বর প্রথম বিধবা বিবাহ প্রচলিত হয় । তিনি বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা ‘এতদ্বিষয়ক’ প্রস্তাব নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এবিষয়ে তিনি ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

উনিশ শতকের বাংলায় ধর্মসংস্কার

আঠারো শতকের শেষদিকেও বাংলার ধর্মীয় জীবনে নানা কুসংস্কারের অস্তিত্ব ছিল। যেমন- গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন, সতীদাহ প্রথা, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি। এই অবস্থায় উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ব্রাহ্ম আন্দোলন, শ্রীরামকৃষ্ণের ‘সর্বধর্ম সমন্বয়’ -র আদর্শ এবং স্বামী বিবেকানন্দের ‘নব্য বেদান্ত’-এর আদর্শ বাংলার ধর্মীয় সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

কেশবচন্দ্র সেন

1858 খ্রিস্টাব্দে কেশব চন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। তিনি ব্রহ্মানন্দ উপাধি পান এবং ব্রাহ্মসমাজের আচার্য হিসেবে নিয়োজিত হন। কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে জাতিভেদ প্রথা, পর্দা প্রথা, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে এবং বিধবা বিবাহ, স্ত্রী শিক্ষা, অসবর্ণ বিবাহ প্রভৃতির প্রসারে ব্যাপক প্রচার চালান। মানবতাবাদ, একেশ্বরবাদ, সর্বধর্ম সমন্বয় প্রভৃতির আদর্শ প্রচারে ব্রাহ্মসমাজ সক্রিয় উদ্যোগ নেয়। শিক্ষার প্রসারের উদ্যোগে তিনি নৈশ বিদ্যালয় এবং মহিলাদের জন্য ভিক্টোরিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ভূমিকা

রামকৃষ্ণের 'সর্বধর্মসমন্বয়'-এর আদর্শ ঊনিশ শতকে খ্রিস্টান মিশনারি, ব্রাহ্মসমাজ ও নব্যবঙ্গের সদস্যরা হিন্দুধর্মের কুসংস্কারগুলিকে ক্রমাগত আক্রমণ করতে থাকলে ভারতের সনাতনধর্মের অগ্রগতি প্রায় দিশাহারা হয়ে পড়ে। এই সময়ে যুগপুরুষরূপে জন্মগ্রহণ করেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ।
তিনি সহজসরল ভাষা ও উপমার সাহায্যে ধর্মীয় মতাদর্শ প্রচার করেন, তা শিক্ষিত-অশিক্ষিত বাঙালি সমাজকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, সকল ধর্মই সত্য । তাঁরই কথায়, 'সব ধর্মের লোকেরা একই ঈশ্বরকে ডাকছে।'
রামকৃষ্ণের প্রচারের ফলে বাংলায় জাতিভেদের কঠোরতা শিথিল হয় এবং ধর্মীয় সমন্বয়ের আদর্শ শক্তিশালী হয়। **যত মত তত পথ** এই আদর্শের দ্বারা তিনি সব ধরনের সাধনার মধ্য দিয়েই ঈশ্বর লাভ সম্ভব বলেন । তিনি বলেন ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য কোন মূর্তি পূজা, শাস্ত্র চর্চা, যাগ-যজ্ঞ, আচার-অনুষ্ঠান এগুলোর প্রয়োজন হয় না তার জন্য প্রয়োজন কেবল আন্তরিক ভক্তির।

নব্য বেদান্তবাদ

বিবেকানন্দের ধর্ম চিন্তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল নব্য বেদান্তবাদ। তিনি মনে করতেন জীবজগতে সবস্থানেই ব্রহ্মের উপস্থিতি, তাই মানব সেবার মধ্য দিয়েই ব্রহ্ম সেবা সম্ভব। এই কারণেই তিনি বলছিলেন **জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর**। প্রাচীন অদ্বৈতবাদে বলা আছে যে, **ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা অর্থাৎ ব্রহ্ম ছাড়া জগতে আর কিছুই নেই** । সাধারণ মানুষের সেবা করাই হল ব্রহ্মের সেবা। বিবেকানন্দের মতে শ্রেণীবিভক্ত বিশ্বসমাজে প্রতিটি শ্রেণীর উপযুক্ত সাধন পথ আছে এবং তার মাধ্যমেই নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে জীবনকে অতিবাহিত করতে হবে। তার এই ব্যাখ্যা **নব্য বেদান্তবাদ** নামে পরিচিত। তবে আধুনিক সময়ে কার্যের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ধর্মীয় সমন্বয়ে লালন ফকিরের ভূমিকা

উনিশ শতকে ধর্মীয় সমন্বয়ের ক্ষেত্রে যেসকল ব্যক্তিরা উদ্যোগ নিয়েছিলেন লালন ফকির ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম । প্রায় দু'হাজার গান রচনার মধ্য দিয়ে লালন ধর্ম সমন্বয়ের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন যা মানবজীবনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং হৃদয়স্পর্শী ।

বর্তমান বাংলাদেশের ঝিনাইদহ জেলার হরিশচন্দ্র পুরে লালনের জন্ম হয়েছিলো, সাল 1774 । তাঁর পিতা ছিলেন মধবরাও ও মাতা ছিলেন পদ্মাবতী দেবী । শিশুকাল থেকেই তিনি ছিলেন সঙ্গীতপ্রিয় । অনেক অল্প বয়সেই লালন সিরাজ সাইয়ের কাছে বাউল গানের দীক্ষা নেন এবং বাউল আখড়া তৈরি করে শিষ্য সহ বসবাস করতে শুরু করেন ।

লালন ফকিরের মতে মানুষের কোনো জাতি, ধর্ম, লিঙ্গভেদ নেই, তাঁর বিশ্বাস ছিল সকল মানুষের মধ্যে বাস করে এক মনের মানুষ । তিনি জাতিভেদ মানতেন না, তাই তাঁর গানগুলোতে মানবতাবাদী ভাব স্পষ্ট ।

‘সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে, লালন বলে জাতের কী রূপ দেখলাম না এই নজরে’ -গানের ভাষায় লালন ফকির মানুষের মনে সর্বধর্ম সমন্বয়কে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে ১১৬ বছর বয়সে লালনের মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পর হিন্দু বা মুসলিম কোনো ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করা হয়নি।

বাংলার নবজাগরণ

উনিশ শতকে বাংলার ধর্ম, সংস্কৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আসে এবং সাংস্কৃতিক ভাবজগতে বৌদ্ধিক আন্দোলন শুরু হয়, যাকে ঐতিহাসিকরা ইতালির নবজাগরণের সাথে তুলনা করে 'Bengal Renaissance ' বা বঙ্গীয় নবজাগরণ বলেছেন ।
নবজাগরণ : সমকালীন বাংলা ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক । এই সময় বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষা, দর্শন, যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ প্রভৃতি বিষয়ে অগ্রগতি ঘটে, একেই নবজাগরণ বলা হয়। নবজাগরণে হিন্দুত্ববাদীদের আধিক্য থাকায় তাকে ধর্মনিরপেক্ষ বলে গণ্য করা যায় না । নবজাগরণ ছিল কলকাতা নির্ভর ফলে বাংলার সর্বত্র অঞ্চলে এর প্রভাব দেখা যায়নি। নবজাগরণে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ সামাজিক সংস্কার কে গুরুত্ব দিলেও, দেশ স্বাধীনের প্রতি তাদের কোনো ঝোঁক ছিল ।
হিন্দু সমাজের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিমরা ছিল অবহেলিত তাই নবজাগরণের সাথে তাদের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। নবজাগরণবাদ সামাজিক ক্ষেত্রে তেমন পরিবর্তন আনতে পারে নি । তাদের মূল দিক শিক্ষা হওয়ার ফলে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস, জাতিভেদ প্রথা প্রভৃতি একইরকম ছিল, কোনো পরিবর্তন আসেনি ।

উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের দুটি প্রধান ধারা ছিল প্রাচ্য-পুনরুজ্জীবনবাদী ধারা এবং পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী ধারা। এ দুটি ধারার পাশাপাশি একটি সমন্বয়বাদী ধারাও এসময় লক্ষ করা যায়।

প্রথমত, প্রাচ্য পুনরুজ্জীবনবাদী ধারার জাগরণে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সনাতনপন্থী, প্রগতিশীল মানসিকতার ব্যক্তিরা। এঁদের মধ্যে বিখ্যাত হলেন রাধাকান্ত দেব, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। তাঁদের লক্ষ্য ছিল প্রাচ্যের সুপ্রাচীন গৌরবময় ঐতিহ্যের যথার্থ পুনরুজ্জীবন ঘটানো।

দ্বিতীয়ত, পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী ধারার মুখপাত্র ছিল নব্যবঙ্গ গোষ্ঠী। তাদের লক্ষ্য ছিল—প্রাচ্যের পশ্চাৎপদ সভ্যতা-সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ বর্জন করে পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা।

তৃতীয়ত, উক্ত দুটি ধারার মধ্যবর্তী স্তরের সমন্বয়বাদী ধারার নেতৃত্বে ছিলেন রামমোহন রায় বিদ্যাসাগর প্রমুখ।